আলো পথ
এমএলই নিউজলেটার
পঞ্চদশ সংখ্যা, জানুয়ারি-মার্চ ২০১৭

মাতৃভাষার সঠিক চর্চা ও বিকাশ চাই

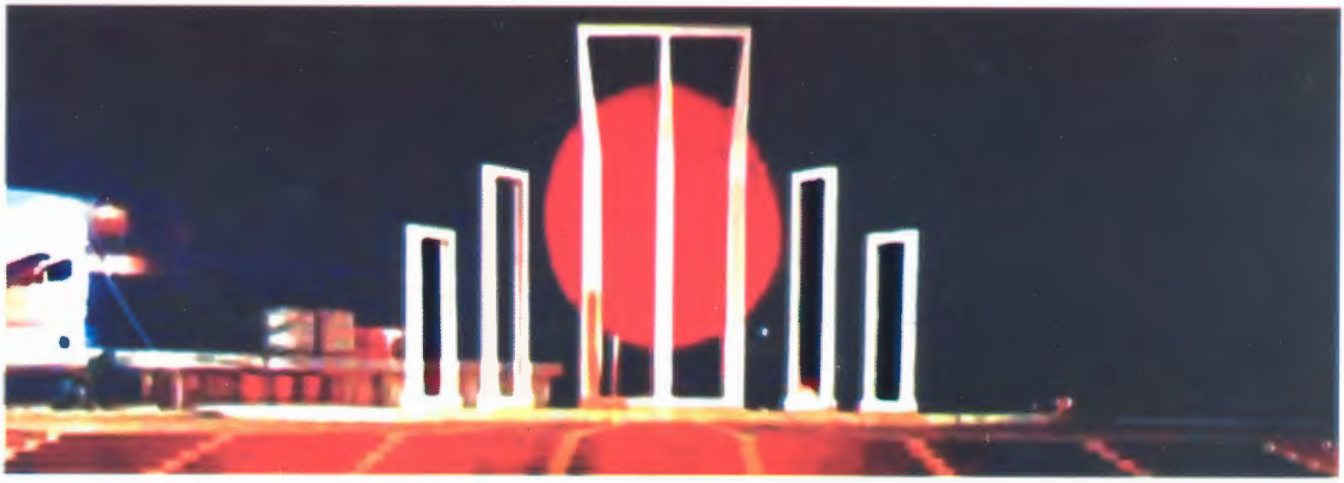

প্রতি বছরের মতো এবারও সারা দেশে ২১ ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালিত হয়। এ উপলক্ষে দেশব্যাপী আয়োজিত হয় নানা ধরনের সভা, সমাবেশ ও আলোচনা অনুষ্ঠান।

অথচ, এ বাংলাভাষায়ই এখন বিকৃত হচ্ছে নানাভাবে। বাংলার সাথে হিন্দি ও ইংরেজি মিশিয়ে এক জগাখিচুড়ি ভাষা তৈরি করা হচ্ছে! অনেক নামী-দামী প্রতিষ্ঠানও এ ক্ষেত্রে উদাসীনতার পরিচয় দিচ্ছে।

আবার, অন্যদিকে এদেশে বসবাসকারী হাজার হাজার আদিবাসী শিশু এখনও মাতৃভাষায় লেখাপড়া শুরু করার অধিকার অর্জন করতে সক্ষম হয়নি। বহুভাষিক এ জনপদে এসকল আদিবাসী শিশু মাতৃভাষা চর্চার অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।

ইউনেস্কোর এবারের আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের প্রতিপাদ্য ছিল, 'বহু ভাষায় শিক্ষা'। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, 'আমরা কথ্য ভাষা বলব, ঠিক আছে। দয়া করে আমাদের ভাষার যে প্রচলিত ধারা সেটাকে এভাবে বিকৃত করে 'বাংরেজি' বলে ফেলছি; এটা যেন আর না হয়। এদিকে একটু বিশেষভাবে দৃষ্টি দেওয়া উচিত।'

শেখ হাসিনা আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট মিলনায়তনে শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস-২০১৭ উপলক্ষে আয়োজিত পাঁচ দিনব্যাপী অনুষ্ঠানমালার উদ্বোধনী ভাষণে এসব কথা বলেন।

ইংরেজি ঢঙে বাংলা বলার প্রবণতা বেড়ে যাওয়া নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে শেখ হাসিনা বলেন, 'এটা ছেলেমেয়েদের মধ্যে সংক্রামক ব্যাধির মতো ছড়িয়ে যাচ্ছে। যেন ওইভাবে কথা না বললে তাদের মর্যাদাই থাকে না। এই জায়গা থেকে আমাদের ছেলেমেয়েদের সরিয়ে আনতে হবে। যখন যেটা বলবে, সেটা সঠিকভাবে বলবে, সঠিকভাবে উচ্চারণ করবে, সঠিকভাবে ব্যবহার করবে। আমাদের ভাইয়েরা জীবন দিয়ে, রক্ত দিয়ে এই ভাষা আমাদের উপহার দিয়ে গেছেন। এর মর্যাদা আমাদের রক্ষা করতে হবে। আমাদের ছেলেমেয়েদের এই ভাষা শিখতে হবে'।

এ প্রসঙ্গে শেখ হাসিনা আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠায় ইউনেস্কোর সহায়তার জন্য জাতিসংঘকে ধন্যবাদ জানান। প্রধানমন্ত্রী আশা প্রকাশ করেন, এই ইনস্টিটিউট একদিন গবেষণা, ভাষা সংরক্ষণ, ভাষা সম্পর্কে আরও জ্ঞান সংরক্ষণ করবে। প্রতিটি ভাষার উৎস কী, কীভাবে বিকশিত হলো, কীভাবে ভাষা বিভিন্ন জাতির কাছে এলো, তা নিয়ে গবেষণার আধার হয়ে উঠবে।

বাংলার পাশাপাশি জীবিকার তাগিদে অন্য ভাষা শেখার ওপর গুরুত্ব আরোপ করে তিনি বলেন, অন্য ভাষার প্রতি বৈরিতা নয়। মাতৃভাষা শিখতে হবে, সঙ্গে সঙ্গে আমরা অন্য ভাষাও শিখব। জীবন-জীবিকার জন্য অনেক সময় অন্য ভাষা শিখতে হয়।

বাংলা ভাষার জন্য আত্মত্যাগের ইতিহাস ব্যাপকভাবে প্রচারের ওপর গুরুত্ব আরোপ করে শেখ হাসিনা বলেন, আমরা বাঙালি, আমাদের প্রতিটি মুহূর্তে সংগ্রাম করে প্রতিটি দাবি অর্জন করতে হয়েছে। কোনো কিছু সহজে আসেনি।

শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদের সভাপতিত্বে এ অনুষ্ঠানে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক জিনাত ইমতিয়াজ আলী, বাংলাদেশে ইউনেস্কোর আবাসিক প্রতিনিধি বিয়েত্রিস কালদান বক্তব্য রাখেন। অনুষ্ঠানে মূল প্রবন্ধ পাঠ করেন ইউনেস্কোর লিংগুয়াপ্যাক্স ইনস্টিটিউটের উপদেষ্টা আনভিটা অ্যাবি। স্বাগত বক্তব্য রাখেন শিক্ষা সচিব সোহরাব হোসেন।

সাঁওতালদের লিপি বিতর্ক ও উত্তরণের উপায়

২০১১ সালের দিকে সরকারিভাবে যখন আদিবাসী শিশুদের প্রাক-প্রাথমিক পর্যায়ে মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের ঘোষণা আসে, ঠিক তখন সাঁওতালদের মধ্যে লিপি বিতর্ক শুরু হয়। সাঁওতালদের একটি অংশ বাংলা হরফ ও আরেকটি অংশ রোমান হরফে শিক্ষাদানের দাবি করে। শেষ পর্যন্ত লিপি বিতর্কের অবসান না হওয়ায় সরকার আদিবাসী শিশুদের প্রাক-প্রাথমিক পর্যায়ে শিক্ষাদান কর্মসূচির প্রথম ধাপ থেকে সাঁওতালি ভাষাকে বাদ দিয়ে বাকি পাঁচটি ভাষায় (চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা, গারো ও সাদরি) পাঠ্যপুস্তক রচনার উদ্যোগ গ্রহণ করে। লিপি বিতর্কের কারণে সমতলের সবচেয়ে সংখ্যাধিক জাতি সাঁওতালরা সরকারি এ সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়েছে।

সারা পৃথিবীতে এক কোটিরও অধিক মানুষ সাঁওতালি ভাষায় কথা বললেও সাঁওতালি লেখার ক্ষেত্রে একক লিপির ব্যবহার এখনো সেভাবে গড়ে ওঠেনি। এমনটি হওয়ার কারণ হিসেবে দেখা যায় সাঁওতালরা সাহিত্য চর্চার জন্য অঞ্চলভেদে তাদের প্রতিবেশী ভাষার বর্ণমালাগুলোকেই ধার করেছে। যেহেতু বাংলাদেশ, নেপাল, ভুটান ও ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে সাঁওতালদের বসবাস, তাই তাদের ধারকৃত বর্ণমালাগুলো বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন রকম হয়েছে। ফলে সাঁওতালি ভাষা লিখিতভাবে চর্চার ক্ষেত্রে অলচিকি, বাংলা, উড়িয়া, রোমান, দেবনাগরি ইত্যাদি বর্ণমালা ব্যবহার করার উদাহরণ তৈরি হয়েছে। এর সঙ্গে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় কারণও যুক্ত হয়েছে। এখান থেকে সাঁওতালি ভাষার লিপি বিতর্কের সূত্রপাত। কিন্তু এরকম অবস্থা কোনো জাতির ভাষার জন্য কখনই শুভ হতে পারে না। এরকম উদাহরণও নেই যে একটি ভাষার জন্য একাধিক স্বীকৃত বর্ণমালা আছে। তবে কেন সাঁওতালদের বেলায় থাকবে? সম্ভবত এরকম চিন্তা ধারা থেকে এবং সাঁওতাল জাতিকে লিপি বিতর্ক থেকে বের করে আনার জন্য ধারকৃত লিপির পরিবর্তে সাঁওতাল পণ্ডিত রঘুনাথ মুরমু ১৯২৫ সালে অলচিকি লিপি উদ্ভাবন করেন। সাঁওতাল সমাজের নিত্য প্রয়োজনীয় ব্যবহার্য, আকার-ইঙ্গিতগুলো দিয়ে সম্পূর্ণ মনোবিজ্ঞান ও বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে অলচিকি লিপি তৈরি হয়েছে বলে অনেক সাঁওতাল এটিকে নিজেদের লিপি হিসেবে বিশ্বাস করতে শুরু করে। এদিকে ২০০২ সালের ডিসেম্বর মাসে অলচিকি বিশ্বের প্রচলিত লিপিসমূহের তালিকা UNICODE ISO/IEC 10646-এ অন্তর্ভুক্ত হয়ে বিশ্বের অন্যতম লিপি হিসেবে স্বীকৃতি পায়। ২০০৩ সালের ২২ ডিসেম্বর ভারতের সংবিধানের শততম সংশোধনীতে সাঁওতালি ভাষা ৮ম তফশীলে অন্তর্ভুক্ত হয়ে সাঁওতালি ভাষার সাংবিধানিক স্বীকৃতি প্রতিষ্ঠা পায় (সাঁওতালি ভাষার সাংবিধানিক স্বীকৃতি- সুবোধ হাঁসদা)। এরই ধারাবাহিকতায় বর্তমানে অলচিকি বর্ণমালায় ভারতে প্রাথমিক স্তর থেকে শুরু করে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত শিক্ষা দান কার্যক্রম চালু হয়েছে। ফলে অলচিকি লিপিকেই এখন অনেকে সাঁওতালি লিপি হিসেবে আখ্যায়িত করছেন।

বাংলাদেশে অলচিকি লিপিতে পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নের যে দাবি এখন নতুন করে জোরালো হচ্ছে, তা নিছকই বাংলা ও রোমান লিপি বিতর্ক থেকে বের হওয়ার জন্য শুধু নয়। বেশ কিছু জোরালো যৌক্তিকতার খাতিরেই অলচিকি গ্রহণের কথা উঠেছে: এক. সাঁওতালি ভাষার জন্য একমাত্র অলচিকি লিপিটি ইউনিকোডভুক্ত হয়েছে। এর ফলে অদূর ভবিষ্যতে উইকিপিডিয়ার মতো অনলাইন দুনিয়ায় সাঁওতালি ভাষায় লিখতে হলে অলচিকি লিপি ব্যবহারের বিকল্প নেই। এ প্রসঙ্গে বলে রাখি, প্রথমত বাংলাদেশে সাঁওতালি ভাষার জন্য রোমান লিপি সমর্থকেরা উইকিপিডিয়ায় রোমান হরফে সাঁওতালি ভাষা লেখার চেষ্টা করলে তা অনুমোদিত হয়নি। দ্বিতীয়ত অলচিকি লিপিতে সাঁওতালি ভাষা উচ্চারণ যথার্থ হয়। সাঁওতালদের দৈনন্দিন ব্যবহার্য জিনিসপত্রের আঙ্গিকে অলচিকি লিপি তৈরি হয়েছে বলে এ লিপিটি খুব সহজেই সাঁওতাল সংস্কৃতি ও জীবনধারার সঙ্গে মিলে যায়। তৃতীয়ত ভারতে বিভিন্ন রাজ্যে সাঁওতালি লেখার ক্ষেত্রে অলচিকি লিপিকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে এবং সাঁওতালি ভাষা অলচিকি লিপিতেই সবচেয়ে বেশি প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ হয়েছে। সেখানে কমপক্ষে ১৫টি কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তরসহ স্নাতক পর্যায়ে শিক্ষা প্রদান এমনকি পিএইচডি ডিগ্রি গ্রহণের সুযোগ তৈরি হয়েছে আর প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে তো দীর্ঘদিন থেকে অলচিকি লিপিতেই শিক্ষাদান চলছে। চতুর্থত বাংলা, দেবনাগরির মতো ভারতীয় অন্যান্য লিপিগুলোতে সাঁওতালি ভাষার উচ্চারণে শুদ্ধতা আসে না। রোমান হরফ অন্যান্য ভারতীয় লিপিগুলোর চাইতে অধিকতর সুবিধাজনক হলেও সাঁওতালি সংক্ষিপ্ত ও দীর্ঘ স্বরবর্ণ এবং গ্লোটাল স্টপ উচ্চারণে ব্যর্থ হয়।

এই বিতর্ক সাঁওতাল সমাজে এক ধরনের অস্থিরতাও তৈরি করেছে। সাঁওতাল সমাজ, সংস্কৃতি-ঐতিহ্য, ভাষাকে রক্ষা করতে গেলে শেকড়ের সূত্র ধরে সমস্ত বিতর্ক থেকে বের হয়ে আসতে হবে। শুধু ভারতবর্ষে নয়, বাংলাদেশ নেপালসহ পৃথিবীর সকল সাঁওতালদের লেখ্যরূপ হিসেবে অলচিকি গ্রহণ করে সাঁওতালি ভাষাকে বিশ্ব দরবারে নতুন করে পরিচয় করিয়ে দিতে হবে। একমাত্র ভাষাই পারবে ভৌগলিক সীমানার গণ্ডি পেরিয়ে সকল সাঁওতালকে ঐক্যবদ্ধ করতে।

মানিক সরেন

শিক্ষাবঞ্চিত রাঙ্গামাটির সীমান্ত এলাকার কয়েক হাজার শিশু

অনেকে এখনো বিদ্যালয় দেখেনি। যারা দেখেছে তাদের কেউ পঞ্চম কেউ অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পড়ালেখা করেছে কিংবা পাস করেছে। এসব হলো ওদের সর্বোচ্চ ডিগ্রি। এমন সব তথ্য পাওয়া যায় রাঙ্গামাটির বরকল উপজেলার বড় হরিণা, ভূষণছড়া, আইমাছড়া ইউনিয়ন ও জুরাছড়ি উপজেলার দুমদুম্যা ইউনিয়নে। ভারত সীমান্তবর্তী এলাকাগুলোতে পর্যাপ্ত বিদ্যালয় না থাকায় ও যোগাযোগ ব্যবস্থা দুর্গম হওয়ায় এখানকার শিশুরা অক্ষরজ্ঞানহীন থেকে যাচ্ছে।

বরকল উপজেলায় ঠেগা নদীর দক্ষিণে আইমাছড়া ইউপির করল্যাছড়ি, পেরাছড়া, ভুয়াটেক, আন্দারমানিক, দুমদুম্যা ইউপির এদছড়ি, আদিয়াপছড়া, কজতলী, মন্দিরাছড়া, বগাখালী, বড় করদিয়া, ছোট করদিয়া, ডুলুছড়ি, সিমেতুলি আদাম, হুলুকছড়া, দুমদুম্যাসহ সীমান্তবর্তী কয়েকটি গ্রামে সম্প্রতি গিয়ে দেখা যায়, এসব এলাকায় অধিকাংশ চাকমা, তঞ্চঙ্গ্যা, পাংখো ও মারমা সম্প্রদায়ের বাস। ১৯৬০ সালে কাপ্তাই বাঁধ নির্মাণের কারণে উদ্ধাস্তু হয়ে এসব সম্প্রদায়ের মানুষ সীমান্ত এলাকায় বসতি গড়ে। বরকলের ভূষণছড়া ইউপির হুববাং থেকে জুরাছড়ি উপজেলার দুমদুম্যা ইউনিয়ন পর্যন্ত এলাকার বিস্তৃতি প্রায় ৭৫ কিলোমিটার। এলাকার মধ্যে রয়েছে আইমাছড়া ইউনিয়ন। দীর্ঘ এ এলাকায় নেই কোনো মাধ্যমিক ও নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়। এছাড়া আইমাছড়া ইউপির মধ্যে কালাবুনছড়া, করল্যাছড়ি, আন্দারমানিক ও দুমদুম্যা ইউপির ভুয়াতলী গ্রামে মোট ৪টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে। দুর্গম যোগাযোগ ব্যবস্থার কারণে এসব বিদ্যালয়ে অন্য গ্রামের শিশুরা যেতে পারে না। আর এসব বিদ্যালয় থেকে যারা প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করে বিদ্যালয় না থাকায় তারা আর উচ্চ শিক্ষা নিতে পারে না। ফলে প্রাথমিক শিক্ষা শেষে শিক্ষাজীবন থেকে ঝরে পড়ে এসব এলাকার শিশুরা।

কথা হয় করল্যাছড়ি গ্রামের স্মৃতি জীবন চাকমা (১১) ও রিয়াজ চাকমার (১১) সঙ্গে। তারা জানায়, তারা ২য় শ্রেণি পর্যন্ত পড়েছে। এখন বিদ্যালয়ে যায় না। যোগাযোগ ব্যবস্থা দুর্গম হওয়ায় তারা স্কুলে যাওয়া বন্ধ করে দিয়েছে। আন্দারমানিক গ্রামের মিন্টু চাকমা (১৬) বলেছে, আমি ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত পড়েছি। এলাকায় মাধ্যমিক বিদ্যালয় না থাকায় পড়া চালিয়ে নেওয়া সম্ভব হয়নি। মা-বাবার পক্ষে শহরের বিদ্যালয়ে ভর্তি করিয়ে পড়াশোনার খরচ চালানো সম্ভব ছিল না।

আইমাছড়া ইউপি চেয়ারম্যান অমর কুমার চাকমা ও দুমদুম্যা ইউপি চেয়ারম্যান শান্তিরাজ চাকমা জানান, এ দুই ইউপিতে কোনো মাধ্যমিক বিদ্যালয় নেই। পর্যাপ্ত প্রাথমিক বিদ্যালয় না থাকায় শিশুরা শিক্ষার্জন থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। এছাড়া শহরে বাসা ভাড়া করে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি করে সন্তানদের পড়াশোনার খরচ চালানো অভিভাবকদের পক্ষে সম্ভব হয় না। ২০১০ সালে গ্রামবাসী জুরাছড়ির বগাখালীতে একটি নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় নির্মাণ করেন। কিন্তু আজ পর্যন্ত এই বিদ্যালয়টির পাঠদান করার প্রাতিষ্ঠানিক কোনো স্বীকৃতি মিলেনি। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক অমর বিকাশ চাকমা বলেন, এখানে ৮ম শ্রেণি পর্যন্ত পাঠদান হয়, কিন্তু ৮ম শ্রেণির পর তারা আবার ঝরে পড়ছে। ওই বিদ্যালয়ের ৭ম শ্রেণির ছাত্র শিখান্তর চাকমা বলে, তাদের ক্লাসে ১৭ জন শিক্ষার্থী আছে। ৮ম শ্রেণির শেষের পর অর্থ সংকটে তাদের কারো ৯ম শ্রেণিতে পড়া সম্ভব হবে না। বরকল উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা মো. মোতালেব বলেন, সীমান্ত এলাকায় যে পরিমাণ প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে সে পরিমাণ মাধ্যমিক বিদ্যালয় নেই। প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলো নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় করা হলে এই ঝরে পড়ার হার কমবে। এর পাশাপাশি উচ্চ বিদ্যালয় নির্মাণের দিকে নজর দিতে হবে।

জুরাছড়ি উপজেলা সহকারি প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার আশিষ কুমার ধর বলেন, দুমদুম্যা ইউপির সীমান্ত এলাকায় স্থানীয় ও এনজিও পরিচালিত প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে। স্থানীয়রা চাঁদা তুলে এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চালিয়ে নিচ্ছেন। এটি যদিও কঠিন, কিন্তু জাতীয়করণ না হওয়া পর্যন্ত এই কাজ চালিয়ে নিতে হবে। প্রাথমিক শিক্ষা শেষে ৬ষ্ঠ শ্রেণিতে পড়তে হলে শিক্ষার্থীদের জুরাছড়ি উপজেলা সদরে আসতে হয়। যোগাযোগ ব্যবস্থা দুর্গম হওয়ায় হেঁটে জুরাছড়িতে আসতে সময় লাগে ২-৩ দিন। রাঙ্গামাটি-২৯৯ আসনের সংসদ সদস্য উষাতন তালুকদার বলেন, সীমান্ত এলাকার শিক্ষাব্যবস্থা বেশ নাজুক। পর্যাপ্ত প্রাথমিক বিদ্যালয় না থাকায় শত শত শিশু অক্ষরজ্ঞানহীন অবস্থায় থেকে যাচ্ছে। নির্মাণ খাতে সীমান্ত এলাকায় বেশি বরাদ্দ রাখতে হবে। কারণ পরিবহন খরচ বেশি হওয়ায় ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানগুলো কাজ করতে আগ্রহী হয় না। ফলে বিদ্যালয়গুলো বছরের পর বছর জরাজীর্ণ পড়ে থাকে।

হিমেল চাকমা

২০১৭ সালের শিক্ষাবর্ষ থেকে প্রাক-প্রাথমিক পর্যায়ের পাঁচটি আদিবাসী ভাষার (চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা, গারো ও সাদরি) শিশুরা নিজ নিজ মাতৃভাষায় শিক্ষা লাভের সুযোগ পেয়েছে। এর ফলে আদিবাসী সমাজে কী ধরনের প্রভাব পরেছে এবং ভবিষ্যৎ করণীয় সম্পর্কে জানিয়েছেন এসব পাঠ্যপুস্তক রচনায় জড়িত আদিবাসী শিক্ষা বিশেষজ্ঞরা

মথুরা বিকাশ ত্রিপুরা
গ্রুপ লিডার, ত্রিপুরা ভাষা

পহর : *এনসিটিবি কর্তৃক আদিবাসী শিশুদের জন্য মাতৃভাষায় প্রাইমার রচয়িতা হিসেবে আপনি কী কী দায়িত্ব পালন করেছেন?*

মথুরা বিকাশ ত্রিপুরা: আমি ত্রিপুরা ভাষায় (ককবরক) শিখন-শেখানো সামগ্রী উন্নয়নের জন্য গঠিত লেখক প্যানেলের একজন সদস্য এবং উক্ত প্যানেলের দলপ্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছি। দলপ্রধান হিসেবে আমি আমার মাতৃভাষা ককবরকের লেখকদের সমন্বয়ের কাজ করেছি, বিভিন্ন শিখন-শেখানো সামগ্রী প্রণয়নে অংশগ্রহণ করেছি এবং এনসিটিবি'র দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা ও সমন্বয়ের মাধ্যমে কার্য সম্পাদন করেছি। পরবর্তীকালে গ্রাফিক্স ডিজাইনারের দায়িত্বও আমি আংশিকভাবে পালন করেছি এবং সম্পাদনার সময়েও সম্পাদনার কাজে নেতৃত্ব প্রদান করেছি। আমি বাংলাদেশের এবং বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বসবাসরত ককবরক ভাষাভাষী ত্রিপুরী জনগণের পক্ষ থেকে এই মহৎ কাজে ত্রিপুরা জাতিগোষ্ঠীর সংশ্লিষ্ট বিষয়ে গবেষক, লেখক ও শিক্ষকদের সম্পৃক্ত করার জন্য বাংলাদেশ সরকার, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডসহ সংশ্লিষ্ট সকলের নিকট আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

পহর : *আপনার এলাকায় এ বছর আদিবাসী শিশুরা শিক্ষা উপকরণ পেয়েছে কি? এতে শিক্ষার্থী ও তাদের অভিভাবকদের অনুভূতি কী?*

মথুরা বিকাশ ত্রিপুরা: আমাদের এলাকা খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার আদিবাসী শিশুরা শিক্ষা উপকরণ পেয়েছে। শিশুরা নিজেদের ভাষায় রচিত বই পেয়ে অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছে। শিশুরা নিজেদের ভাষায় শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ পাচ্ছে দেখে অভিভাবকরা অত্যন্ত খুশি। তবে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের মধ্যে মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা গেছে। তাঁদের অনেকেই প্রদত্ত শিক্ষা উপকরণ ব্যবহার করে শিক্ষার্থীদের পাঠদানের লক্ষ্যে নিজেরাই অধ্যয়ন শুরু করেছেন। আবার অনেক শিক্ষক-শিক্ষিকা উপকরণগুলো কীভাবে পাঠদান করা হবে, তার সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা না পেলে পড়ানো উচিত নয়- বলে তা স্পর্শ করেও দেখেননি। আবার হাতেগোনা কিছু শিক্ষক-শিক্ষিকা বিশেষ করে যাঁরা স্কুলে বেশি সময় দিতে চান না, তাঁরা এই শিক্ষা উপকরণগুলোকে বাড়তি কাজের বোঝা হিসেবে বিবেচনা করছেন। তবে সব মিলিয়ে ইতিবাচকভাবেই অধিকাংশ মানুষ এটি গ্রহণ করেছেন।

পহর : *আদিবাসী শিশুরা মাতৃভাষায় শিক্ষা উপকরণ পাওয়াতে তাদের কী কী ধরনের উপকার হবে বলে আপনি মনে করছেন?*

মথুরা বিকাশ ত্রিপুরা: ১. শিক্ষার্থীদের জন্য আনন্দদায়ক পরিবেশ তৈরি হবে; ২. শিক্ষার্থী ভর্তির হার বৃদ্ধি পাবে এবং স্কুল থেকে ঝরে পড়া হ্রাস পাবে; ৩. পাঠ্য বিষয়সমূহ শিশুরা সহজে বুঝতে সক্ষম হবে; ৪. শিশুদের মাঝে আত্মবিশ্বাস সুদৃঢ় হবে; ৫. মাতৃভাষার উপর ভিত্তি করে বাংলা ও ইংরেজি পর্যায়ক্রমে শেখার ক্ষেত্রে শিশুদের দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে; ৬. ত্রিপুরাদের ভাষা সংরক্ষণ ও উন্নয়নে সহায়তা করবে; ৭. শিশুদের তাদের নিজ নিজ ভাষায় একাডেমিক ধারণাগুলো বুঝতে সহায়ক হবে।

পহর : *আদিবাসী জাতি-গোষ্ঠীর একজন সদস্য হিসেবে বর্তমান সরকারের এই উদ্যোগ বাস্তবায়নে আপনার আর কোনো করণীয় আছে কী? থাকলে উল্লেখ করুন।*

মথুরা বিকাশ ত্রিপুরা: সকল আদিবাসী লেখক-গবেষকদের প্রতিনিয়ত সাহিত্য সৃষ্টি করা দরকার এবং সমাজে বিদ্যমান মৌখিক সাহিত্যগুলো সংরক্ষণ করে প্রকাশের উদ্যোগ নেওয়া দরকার। আমিও ব্যক্তিগতভাবে এরূপ উদ্যোগে সম্পৃক্ত রয়েছি এবং তা অব্যাহত থাকবে বলে আশা রাখি।

পহর : *উপর্যুক্ত প্রসঙ্গে আপনি আর কিছু বলতে চান কী?*

মথুরা বিকাশ ত্রিপুরা: বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠান বিশেষ করে- পার্বত্য জেলা পরিষদসমূহ, বাংলা একাডেমি, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউটগুলোর উচিত বিভিন্ন আদিবাসী জাতির ভাষায় সাহিত্য প্রকাশনা ও গবেষণার জন্য পর্যাপ্ত অর্থ বরাদ্দ দেওয়া এবং পৃষ্ঠপোষকতা করা। শব্দ ভাণ্ডার, অভিধান, পরিভাষা, প্রবাদ, কবিতা, ছড়া, গল্প সংকলন ইত্যাদি প্রকাশে এরূপ পৃষ্ঠপোষকতার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

ডা. অংক্যজাই মারমা
গ্রুপ লিডার, মারমা ভাষা

পহর : *এনসিটিবি কর্তৃক আদিবাসী শিশুদের জন্য মাতৃভাষায় প্রাইমার রচয়িতা হিসেবে আপনি কী কী দায়িত্ব পালন করেছেন?*

ডা. অংক্যজাই মারমা: এনসিটিবি কর্তৃক তৈরিকৃত সকল বাংলা মাধ্যম প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার উপকরণগুলো মনোযোগ সহকারে পড়ে বুঝতে চেষ্টা করেছি। তারপরেই NCTB তে শিক্ষাবিদদের প্রাক- প্রাথমিক শিক্ষা সম্পর্কে পরিকল্পনাগুলো বুঝতে সক্ষম হয়েছি এবং সেই অনুযায়ী মারমা ভাষায় শিক্ষা উপকরণ তৈরি করা সম্ভব হয়েছে।

পহর : *আপনার এলাকায় এ বছর আদিবাসী শিশুরা শিক্ষা উপকরণ পেয়েছে কি? এতে শিক্ষার্থী ও তাদের অভিভাবকদের অনুভূতি কী?*

ডা. অংক্যজাই মারমা: হ্যাঁ। শিশুদের শিক্ষা উপকরণ দেওয়া হলেও অদ্যাবধি শিশুদের পড়ানো হয় নাই। কারণ শিক্ষকেরা প্রশিক্ষণ পায় নাই। অভিভাবকদের অনুভূতি ভালো লক্ষ করা যায়। কারণ দীর্ঘদিন পরে হলেও সরকার আদিবাসী শিশুদের মাতৃভাষায় শিক্ষা দেওয়ার পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন। সমাজের অভিভাবকগণ সরকার এবং দেশের জনগণকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেছেন। অভিভাবকগণ মনে করেন মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা শুরু করা গেলে এটা তাদের সন্তানদের জীবনে আশীর্বাদ হিসেবে কাজ করবে।

পহর : *আদিবাসী শিশুরা মাতৃভাষায় শিক্ষা উপকরণ পাওয়াতে তাদের কী কী ধরনের উপকার হবে বলে আপনি মনে করছেন?*

ডা. অংক্যজাই মারমা: শিশুদের শিক্ষা মাতৃভাষা দিয়ে শুরু হলে শিক্ষার সুফল শতভাগ পাবে। যেমন- শিক্ষাকে শিশুরা সমূলে বুঝতে পারবে। শিশুদের শিক্ষার বিষয়ে জড়তা থাকবে না। শিক্ষার ক্ষেত্রে আত্মবিশ্বাস তৈরি হবে। শিক্ষাকে শিশুরা বোঝা মনে করবে না বরং আনন্দদায়ক হিসেবে গ্রহণ করবে।

পহর : *আদিবাসী জাতি-গোষ্ঠীর একজন সদস্য হিসেবে বর্তমান সরকারের এই উদ্যোগ বাস্তবায়নে আপনার আর কোনো করণীয় আছে কী? থাকলে উল্লেখ করুন?*

ডা. অংক্যজাই মারমা: সরকারের এই উদ্যোগ জনকল্যাণমূলক অবশ্যই। সেহেতু আমাদের অনেক কিছু করণীয় আছে। এই কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য মারমা ভাষায় পারদর্শী নিয়োগ প্রাপ্ত সরকারের কোনো কর্মকর্তা বা কর্মচারী নাই। তাই আমরা যারা মাতৃভাষা উন্নয়নকর্মী তাদের আন্তরিকতার সঙ্গে সরকারের কাজে সহযোগিতা করা উচিত।

পহর : *উপর্যুক্ত প্রসঙ্গে আপনি আর কিছু বলতে চান কী?*

ডা. অংক্যজাই মারমা:

- NCTB তে মারমা ভাষা পারদর্শী কর্মকর্তা বা কর্মচারী নিয়োগ থাকা দরকার বলে আমি মনে করি।
- শিশুদের মানসম্মতভাবে পড়াবার জন্য মাতৃভাষায় লেখাপড়া পারদর্শী শিক্ষক নিয়োগ করা দরকার। মারমা ভাষায় লেখাপড়া জানা না থাকায় শিক্ষকেরা এখনও কিছু পড়াতে পারছেন না।
- মারমা জনগোষ্ঠী এখনও অধিকাংশই তাঁদের মাতৃভাষায় কথা বলতে পারেন। মারমা শিক্ষকদের জন্য যথাযথ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হলে ছাত্র শিক্ষক উভয়ের মঙ্গল হবে এবং সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উদ্দেশ্য পরিপূর্ণভাবে সার্থক হবে।

ঐতিহ্যগাথা

হাজং ভাষা

হাজংলা ইতিহাস

বাংলাদেশনি বাখার আদিবাসী বসবাসকে আছে। হাজং হুলে উমলৌগিলৌনি এগরা। হাজংগিলী বাংলাদেশলা ময়মনসিংহ, নেত্রকোণা, সুনামগঞ্জ ও শেরপূর জিলৌলী উত্তুরফালে বসবাসকে আছে। ই-ছাড়া ভারতলা মেঘালয়, আসাম ও অরুনাচল প্রদেশনিকেও আছে। নৃতাত্ত্বিক বুইশিষ্ট্য উনুযায়ী হাজংগিলী বোড়গুষ্ঠিলী ইন্দো-মঙ্গলীয়ী শাখাভুক্ত। আগতে হাজংগিলৌলী নাম থাকিবীন বাদু হাজন। মোঙ্গলীয় কাচারীলী মূল বংশ হুলে ১২টা। হাজং হুলে উদৌলী এগরা বংশ।

খ্রিষ্টপূর্ব ৪০০০ অব্দে তিব্বত হুইয়ী হাজংগিলী আসামনি আহে। উ-সুমুয়নি ওরা কোচ বিহারলী উত্তুরফালে ভুটানসীমনৌনি বসতগারিবীন। পাছে উরা ব্রহ্মপুত্র গাঙ্গলা পূশ্চিমফালে গোয়ালপাড়া ও হাজোনগরলা বিভিন্ন জায়গানি ছুড়িয়ী পড়ে। পাছে আবার উবায় থকন মেঘালয়লা পূশ্চিম-দুক্ষিণ ও ময়মনসিংহলা উত্তুরফালে আহে।

হাজংগিলী আসলে ভুই কামকে খায়। একখানতে থুবীবাইন্নী দাহা কুলানি থাকে। আগতে মাতৃতান্ত্রিক হুলেও ইলা পিতৃতান্ত্রিক সুমাজ ব্যবস্থা চুলিবী লাগিছে। মাও বংশ ধারাগে নিকনি কয়। ইলাও নিজবংশলা নিকনি বিয়ী কুরিলে সুমাজ ভালা না পায়। হাজংগিলৌলী সুমাজলা অনুশাসন ধাপে ধাপে গড়া। কয়-এগরা পুরিবার নিয়ী পাড়া হয়। আবার কয় এগরা পাড়া নিয়ী এগরা গাও হয়। পাড়া ও গাওলা একজন প্রুবীন ও জ্ঞানিগে গাও প্রধান বানায়। উগে গাও বুড়ী কয়। আবার কয় এগরা গাও নিয়ী এগরা পরগনা বা চাকলা হয়। চাকলা লা প্রধানগে শ্বরেমড়ল কয়।

আরু ধর্মীয় অনুশাসন অধিকার ও পূরোহিতগিলী চালায়। হাজংগিলী গাওনি পূজীপার্বন পূরিচালনা কুরবাগে গাও পূজীরী বানায়। হিল জাগ্‌গী পূজীরী বানায়। উপূজীরীগে নুংটাং কয়। হাজংগিলী সনাতন ধর্ম অনুসারী আরু উমলা প্রধান দেও হুলে মা কামাখ্যা। হাজংগিলী অহমিয়া, মৈথিলা ও বাংলা অপভ্রংশ মিলী রাও কয়। হাজং তিমৌদ বুকুনি পাথিন, ব্লাউজ ও ফুলাঙ্গন পরে। হাজং মরদ হাতু উফুরবায় ধুতি ও গাওনি ফুতুয়ী পরে। হাজংগিলৌলী প্রধান উৎসব চরমাগা ও বাস্তুপূজী। ই-উপমহাদেশলা বিভিন্ন অধিকার আন্দোলন সংগ্রামনি হাজংগিলৌলী অবদান উতি গৌরুবজনক।

স্বপন হাজং

বাংলা ভাষা

হাজংদের ইতিহাস

বাংলাদেশে অনেক আদিবাসী জনগোষ্ঠী বাস করে। তাদের মধ্যে একটি হলো হাজং। হাজংরা বাংলাদেশের ময়মনসিংহ, নেত্রকোণা, শেরপুর এবং সুনামগঞ্জ জেলায় বসবাস করে। এছাড়াও ভারতের মেঘালয়, আসাম ও অরুণাচল প্রদেশেও তাদের বসবাস রয়েছে। নৃতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে হাজংরা বোড় গোষ্ঠীভুক্ত ইন্দো-মঙ্গলীয় শাখার অন্তর্ভুক্ত। মঙ্গলীয়-কাছারীর মূল বংশ ১২টি। তাদের মধ্যে একটি হলো হাজং। হাজংদের আদি নাম ছিল বাদু হাজন।

খ্রিষ্টপূর্ব ৪০০০ অব্দে হাজংরা তিব্বত হয়ে আসামে প্রবেশ করে। সেই সময় তারা কোচবিহারের উত্তরাংশে ভুটানের সীমানায় বসবাস করত। পরবর্তী সময়ে হাজংরা ব্রহ্মপুত্র নদের পশ্চিম পাড়ে গোয়ালপাড়া ও হাজো নগরের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়ে। আবার সেখান থেকেও অনেকেই মেঘালয়ের পশ্চিম-দক্ষিণ এবং বৃহত্তর ময়মনসিংহের উত্তরাংশে চলে আসে।

হাজংরা মূলত কৃষিজীবী। তারা সংঘবদ্ধভাবে পাহাড়ের ঢালে বসবাস করে। পূর্বে তাদের সমাজব্যবস্থা ছিল মাতৃতান্ত্রিক, বর্তমানে পিতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা প্রচলিত। মাতৃবংশের ধারাকে নিকনি বলে। আজও স্বগোত্রীয় নিকনির মাঝে বিয়ে সামাজিক অপরাধ। হাজংদের সামাজিক অনুশাসন ব্যবস্থা কয়েক ধাপে বিভক্ত। কয়েকটি পরিবার নিয়ে পাড়া হয়। আবার কয়েকটি পাড়া নিয়ে হয় একটি গ্রাম। পাড়া ও গ্রাম একজন বয়স্ক ও জ্ঞানী ব্যক্তির দ্বারা পরিচালিত হয়। তাকে গাঁও বুড়া বলে। আবার কয়েকটি গ্রাম নিয়ে একটি পরগণা বা চাকলা হয়। চাকলার প্রধানকে শ্বরেমড়ল বলে।

ধর্মীয় অনুশাসন অধিকারী ও পুরোহিত দ্বারা পরিচালিত হয়। গ্রামের পূজা-পার্বণ পরিচালনা করার জন্য সবাই মিলে একজনকে পূজারী বানায়। পাথর চালানের মাধ্যমে একই পূজারী নিয়োগ হয়। এই পূজারীকে নুংটাং বলে। হাজংরা সনাতন ধর্ম অনুসারী এবং প্রধান আরাধ্য দেবী মা কামাখ্যা। অহমিয়া মৈথিলী ও বাংলা অপভ্রংশ মিশ্রিত রূপের ভাষায় হাজংরা কথা বলে। হাজং মহিলারা পাথিন, ব্লাউজ ও ফুলাঙ্গন পরে। পুরুষরা হাঁটুর উপরে ধুতি ও ফতুয়া পরে। হাজংদের প্রধান উৎসব চরমাগা ও বাস্তুপূজা। উপমহাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলন, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধসহ বিভিন্ন অধিকার আন্দোলন ও সংগ্রামে হাজংদের সক্রিয় ভূমিকা গৌরবজনক।

অনুবাদ : হাজং হরিদাস রায়

পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী শিশুর মাতৃভাষাভিত্তিক বহুভাষিক শিক্ষার বর্তমান চিত্র বিষয়ক মতবিনিময় সভা

গণসাক্ষরতা অভিযান ও সহযোগী সংগঠনের উদ্যোগে বিগত ২৬, ২৭ ও ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৭ যথাক্রমে খাগড়াছড়ি, রাঙ্গামাটি ও বান্দরবান জেলায় 'পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী শিশুর মাতৃভাষাভিত্তিক বহুভাষিক শিক্ষার বর্তমান চিত্র' শীর্ষক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। খাগড়াছড়ি জেলায় বেসরকারি উন্নয়ন সংগঠন জাবারাং কল্যাণ সমিতি, রাঙ্গামাটি জেলায় স্ট্র্যাটেজিক অ্যাকশন সোসাইটি (সাস) এবং বান্দরবান জেলায় কাপেং ফাউন্ডেশন উপর্যুক্ত মতবিনিময় সভাগুলো আয়োজন করে। মতবিনিময় সভাগুলোতে জেলা প্রশাসক, চাকমা রাজা ব্যারিস্টার দেবাশীষ রায়, সংসদ সদস্য, জেলা পরিষদের প্রতিনিধি, জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা, উপজেলা চেয়ারম্যান, উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা, শিক্ষক, শিক্ষার্থী, অভিভাবক, সাংবাদিকসহ স্থানীয় সুশীল সমাজের প্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন। 'পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী শিশুর মাতৃভাষাভিত্তিক বহুভাষিক শিক্ষার বর্তমান চিত্র' শীর্ষক সমীক্ষা প্রতিবেদনের প্রাপ্ত ফলাফলসমূহ উপস্থাপন করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষা বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. সৌরভ সিকদার। মতবিনিময় সভায় উপস্থাপিত বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার পর স্থানীয় পর্যায়ে নিচের সুপারিশসমূহ গৃহীত হয়:

- মাতৃভাষাভিত্তিক বহুভাষিক প্রাথমিক শিক্ষা বিষয়ে সামাজিক সচেতনতা বাড়ানোর লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট সকলের সঙ্গে একত্রে কাজ করা;
- শিক্ষকদের দীর্ঘমেয়াদী প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করার জন্য জেলা পর্যায়ে প্রশিক্ষণ কেন্দ্র গড়ে তোলা;
- আদিবাসী গোষ্ঠীর মধ্যে যারা ভাষা বিষয়ে দক্ষ তাদের সম্পৃক্ত করা;
- প্রচুর বহুভাষিক বই তৈরি করা দরকার এবং বাঙালি শিক্ষকরাও যেন বহুভাষিক শিক্ষা দিতে পারে এর জন্য তাদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা;
- সরকারি-বেসরকারি পৃষ্ঠপোষকতা আদিবাসী ভাষায় সাহিত্যচর্চা বাড়ানোর উদ্যোগ নেওয়া, এক্ষেত্রে জেলাভিত্তিক সাহিত্য কমিশন গঠন করা যেতে পারে এবং পাক্ষিক, মাসিক বা ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে সাহিত্য সাময়িকী প্রকাশ করা;
- বহুভাষিক ব্যবস্থার শিক্ষার্থীরা প্রাক-প্রাথমিক থেকে যখন প্রাথমিক শিক্ষা স্তরে প্রবেশ করবে তখনও তাদের বিকাশের ধারা অব্যাহত রাখার জন্য বিদ্যালয়ের সকল শিক্ষককেই মাতৃভাষাভিত্তিক বহুভাষিক শিক্ষা সম্বন্ধে প্রশিক্ষণ দেওয়া;
- পার্বত্য তিন জেলায় কর্মরত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের তালিকা করা, এর মাধ্যমে কোন বিদ্যালয়ে কতজন এবং কোন ভাষাভাষী কতজন শিক্ষক প্রয়োজন সেই বিষয়ে বাস্তব চিত্র পাওয়া যাবে যা শিক্ষক নিয়োগে সহায়ক হবে;
- পার্বত্য এলাকায় শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে আদিবাসী ভাষাজ্ঞানকে বিশেষ যোগ্যতার মানদণ্ড হিসেবে নির্ধারণ করা। যারা একাধিক ভাষায় পাঠদানে পারদর্শী তাদেরকে অগ্রাধিকার দেওয়া।

গিয়াস উদ্দিন আহমেদ

এমএলই ফোরামের ৩৯তম সভা অনুষ্ঠিত

১২ জানুয়ারি ২০১৭ বিকাল ৩.৩০ মিনিটে গণসাক্ষরতা অভিযান প্রশিক্ষণ কক্ষে 'এমএলই ফোরাম'-এর ৩৯তম সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন জনাব আলবার্ট মানকিন।

সভায় এমএলই কার্যক্রমের অগ্রগতি নিয়ে আলোচনা করা হয়। জনাব তপন কুমার দাশ এ বিষয়ে বলেন, ইতিমধ্যে আদিবাসী শিশুদের জন্য নিজ ভাষায় প্রাক-প্রাথমিক স্তরে শিক্ষা উপকরণ দেওয়া হয়েছে। এ বিষয়ে এমএলই ফোরামের পক্ষ থেকে সরকারকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে চিঠি দেওয়া হবে। গারো, ত্রিপুরা ও সাদরি ভাষায় এখনও এমএলই উপকরণ পায়নি। অনতিবিলম্বে এসব আদিবাসী শিশুদের হাতে প্রাক-প্রাথমিক উপকরণ পৌছে দেওয়া জরুরি। এছাড়া শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ, কীভাবে পড়ানো হবে ইত্যাদি বিষয়ে এখনও কোনো অগ্রগতি নেই। পাশাপাশি যে সব শিক্ষার্থী প্রথম শ্রেণিতে উঠবে, তাদের ব্যাপারেও সিদ্ধান্ত নেওয়া প্রয়োজন। সরকার যদি ১ বছরের মধ্যে প্রথম শ্রেণির উপকরণ তৈরির কাজ না করতে পারে এবং কোন উদ্যোগ গ্রহণ না করে তবে সে ক্ষেত্রে NGO-দের উন্নয়নকৃত বই ব্যবহার করা যেতে পারে।

জনাব গোলাম মোস্তফা দুলাল বলেন, মাত্র ৫টি ভাষায় উপকরণ উন্নয়ন হলেও অন্যান্য ভাষার জন্যও দ্রুত উদ্যোগ গ্রহণ করা দরকার। সেক্ষেত্রেও প্রথমেই অন্যান্য ভাষার জন্য MLE বিষয়ে Mapping হওয়া জরুরি। সাঁওতালরা বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্নভাবে আছে। এ সমস্যার দ্রুত সমাধান হওয়া দরকার। সংশ্লিষ্ট ভাষার মানুষজন যদি আন্তরিক হয়, তবে এমএলই বিষয়ে অবশ্যই অগ্রগতি হবে। তবে সে জন্য জাতীয় বাজেটে এ ব্যাপরে সুস্পষ্ট খাত বরাদ্দ থাকতে হবে।

জনাব আলবার্ট মানকিন বলেন, সাঁওতালদের জন্য ২টি ভাষায় উপকরণ উন্নয়ন করলে তাদের মধ্যে আরও দ্বন্দ্ব বেড়ে যাবে কিনা সে ব্যাপারে ভেবে দেখা দরকার।

জনাব মথুরা বিকাশ ত্রিপুরা বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রামে এমএলই উপকরণের মধ্যে শুধু খাতা এবং শিক্ষক সহায়িকা দেওয়া হয়েছে, কিন্তু অন্যান্য উপকরণ এখনও দেয়া হয়নি।

শাহ্ আলম

খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলায় স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম পতাকা উত্তোলনকারী

সুবোধ বিকাশ ত্রিপুরা

কর্মজীবনে সুবোধ বিকাশ ত্রিপুরা

অবসর গ্রহণের পর বার্ধক্যে সুবোধ বিকাশ ত্রিপুরা

খাগড়াছড়ির বীর মুক্তিযোদ্ধা সুবোধ বিকাশ ত্রিপুরা। পিতার নাম যোগেশ চন্দ্র ত্রিপুরা ও মায়ের নাম জানকী দেবী ত্রিপুরা। ৯ সেপ্টেম্বর ১৯৩৮ সালে তিনি জন্ম গ্রহণ করেন ভারতের দেমাগ্রী নামক স্থানে। দেশ ভাগের পর ১৯৫২ সালে তিনি তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের রামগড় মহকুমায় এসে বসবাস শুরু করেন। মুক্তিযুদ্ধকালে রামগড় বর্ডার বেল্টের কমান্ডার ছিলেন। ১৯৭১ সালের অগ্নিঝরা দিনগুলোতে সফলতার সঙ্গে মুক্তিকামী মানুষদের নেতৃত্ব দিয়েছেন। তিনি ১৯৭১ সালে গঠিত রামগড় আওয়ামী সংগ্রাম পরিষদের যুগ্ম আহবায়ক ছিলেন। এই পদে থেকে তিনি অসহযোগ আন্দোলন ও প্রতিরোধ সংগ্রামের অগ্রভাগে অবস্থান করে তাঁর অনুসারীদের সঠিক দিকনির্দেশনা প্রদান করেন। ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের বগাফা একাডেমিতে গেরিলাযুদ্ধের প্রশিক্ষণ শেষে তিনি ২১০ নং গ্রুপ কমান্ডার নিযুক্ত হন এবং ১ নং সেক্টরের আওতায় বিভিন্ন এলাকায় সফল গেরিলা অপারেশন চালিয়ে পাকবাহিনীর পরাজয় নিশ্চিত করেন। তাঁর কমান্ডে ১০৪ জন মুক্তিযোদ্ধা সম্মুখ সমরে ঝাঁপিয়ে পড়েন। যুদ্ধের দামামা তুঙ্গে থাকা অবস্থায় ১৯৭১ সালের ১২ এপ্রিল রামগড় উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে খাগড়াছড়ি জেলা তথা তৎকালীন রামগড় মহকুমায় সর্বপ্রথম স্বাধীন বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা উত্তোলনের উদ্যোগ নেওয়া হয়। তৎকালীন পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলার জেলা প্রশাসক ও মুক্তিযুদ্ধের সংগঠক এইচ টি ইমামের উপস্থিতিতে পতাকাটি উত্তোলন করেন বীর মুক্তিযোদ্ধা সুবোধ বিকাশ ত্রিপুরা। তাঁর ভাষ্যমতে, অনুষ্ঠানে উপস্থিত ব্যক্তিবর্গ তৎকালীন পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলার জেলা প্রশাসক ও মুক্তিযুদ্ধের সংগঠক এইচ টি ইমাম-কে পতাকাটি উত্তোলন করতে বললে তিনি পতাকার রশিটি মুক্তিযোদ্ধা সুবোধ বিকাশ ত্রিপুরার হাতে তুলে দিয়ে বলেছিলেন, 'পতাকাটি এই বীর মুক্তিযোদ্ধারই উত্তোলন করা উচিত।' এই বীর মুক্তিযোদ্ধা রামগড়ের পার্শ্বস্থ মাটিরাঙ্গা উপজেলার তবলছড়ি সীমান্তে এক ঝাঁক মুক্তিসেনাকে নেতৃত্ব দিয়ে পাক হানাদারবাহিনীর বিরুদ্ধে সম্মুখ যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন এবং যুদ্ধে হানাদারবাহিনীকে পরাজিত করে এলাকা শত্রুমুক্ত করেছিলেন।

পেশাগত জীবনে তিনি *দৈনিক ইত্তেফাক, বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা (বাসস), বাংলাদেশ টেলিভিশনসহ* বিভিন্ন গণমাধ্যমে কাজ করেছেন। ১৯৭৩ সালের ১ জুলাই *দৈনিক ইত্তেফাক*-এর রামগড় মহকুমা সংবাদদাতা হিসেবে তাঁর কর্মজীবনের শুরু। ২০০৬ সালে ব্রেন স্ট্রোক করার পর শারীরিকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়লে তিনি *ইত্তেফাক* থেকে অবসর নেন। অসুস্থতাজনিত কারণে তাঁর স্পষ্টভাবে কথা বলতে কষ্ট হতো এবং অধিকাংশ সময় স্মৃতিভ্রম হতো। তাই খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলায় স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলনের তারিখ হিসেবে তিনি প্রথমে ১৯৭১ সালের ১২ মার্চ তারিখ বলে উল্লেখ করেছিলেন, যা বাংলা একাডেমির লোকজ সংস্কৃতি গ্রন্থমালাতে ছাপা হয়। পরবর্তী সময়ে তিনি তা বুঝতে পেরে একাধিক স্থানে এই ভুল সংশোধন করেন এবং অবহিত করেন, ১২ এপ্রিল তারিখেই খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলায় তথা তৎকালীন রামগড় মহকুমায় স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করা হয়েছিল।

২০ সেপ্টেম্বর ২০১৬ ভোর ৩ টায় এই মহান মুক্তিযোদ্ধার দেহাবসান হয়। মৃত্যুকালে তিনি ২ ছেলে ও ৪ মেয়ে রেখে যান।

সূত্র: বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি গ্রন্থমালা- খাগড়াছড়ি জুন ২০১৪, জাবারাং ডায়েরি ২০১৫, দৈনিক ইত্তেফাক ২০ সেপ্টেম্বর ২০১৬।

মথুরা বিকাশ ত্রিপুরা

গণসাক্ষরতা অভিযান কর্তৃক এমএলই নিউজলেটার পহর প্রকাশিত হচ্ছে। এই পত্রিকার মান উন্নয়নের জন্য মতামত প্রদান করতে সকলের প্রতি আহ্বান জানানো হচ্ছে। এ বিষয়ে যে কোনো ধরনের মতামত 'গণসাক্ষরতা অভিযান'-এর ঠিকানায় পাঠানোর অনুরোধ রইল।

ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন-এর সহায়তায় 'অঙ্গীকার' প্রকল্পের আওতায় **গণসাক্ষরতা অভিযান** কর্তৃক
৫/১৪ হুমায়ুন রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭ থেকে প্রকাশিত।
ফোন : ৮১১৫৭৬৯; ৯১৩০৪২৭, ৫৮১৫৫০৩১-২; ফ্যাক্স : ৯১২৩৮৪২
ই-মেইল : info@campebd.org; ওয়েব : www.campebd.org
www.facebook.com/campebd, www.twitter.com/campebd

European Union